بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ১৫ এপ্রিল, ২০২২ মোতাবেক ১৫ শাহাদত, ১৪০১ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

গত খুতবার পূর্বের যে খুতবা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র বিভিন্ন ঘটনা সম্পর্কে দেওয়া হয়েছিল তাতে বিভিন্ন উদ্ধৃতি তুলে ধরা হয়েছিল যদ্বারা প্রমাণিত হয় যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মুরতাদদেরকে তাদের ধর্মত্যাগের কারণে শাস্তি প্রদান করেন নি বরং বিদ্রোহ এবং যুদ্ধের কারণে তাদের প্রতিউত্তর দেওয়া হয়েছিল মাত্র। এ সম্পর্কে যুগের হাকাম ও আদাল (অর্থাৎ, ন্যায়বিচারক ও মীমাংসাকারী) হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.)ও হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র খিলাফতকালের সেই ধর্মত্যাগকে অবাধ্যতা ও বিদ্রোহ আখ্যা দিয়েছেন। এ প্রসঙ্গে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র বীরত্ব ও সাহসিকতা কীরূপ ছিল তা উল্লেখ করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন,

"সত্য-সন্ধানীদের এটি অজানা নয় যে, তাঁর খিলাফতকাল আশঙ্কা ও বিপদসংকুল যুগ ছিল। কেননা, মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকালের পর ইসলাম ও মুসলমানদের ওপর বিপদাবলী নেমে আসতে থাকে। অগণিত মুনাফিক মুরতাদ হয়ে যায় আর মুরতাদরা ধৃষ্ট হয়ে ওঠে। মিথ্যাবাদীদের এক শ্রেণী নবুয়্যতের দাবী করে বসে আর অগণিত মরুবাসী বেদুঈন তাদের দলে যোগ দেয়। এক পর্যায়ে মুসায়লামা কায্যাবের সাথে প্রায় এক লক্ষ অজ্ঞ ও দুরাচারী লোক যোগ দেয়। আর নৈরাজ্য মাথাচাড়া দেয়, সমস্যা ঘনীভূত হয়, দূর-নিকটের সবকিছুই সমস্যা কবলিত হয়ে পড়ে আর মু'মিনরা প্রচণ্ডভাবে প্রকম্পিত হন। এমতাবস্থায় প্রত্যেক ব্যক্তি পরীক্ষার সম্মুখীন হয় আর কাণ্ডজ্ঞান লোপ পাওয়ার মত ভীতিপ্রদ পরিস্থিতির উদ্ভব ঘটে। আর মু'মিনরা এতটাই অসহায় হয়ে পড়েছিলেন যেন তাদের হৃদয়ে আগুনের অঙ্গার জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছিল অথবা তাদেরকে ছুরি দিয়ে জবাই করে দেওয়া হয়েছে। একদিকে তো তারা শ্রেষ্ঠ মানব (সা.)-এর বিয়োগান্তক বেদনায় কাঁদছিলেন অপরদিকে সেসব অরাজকতার কারণে অশ্রু বিসর্জন দিচ্ছিলেন যা ভস্মকারী অগ্নির ন্যায় আবির্ভূত হয়েছিল। কোথাও শান্তির কোন নামগন্ধও ছিল না। নৈরাজ্যবাদীরা আবর্জনার স্তুপে গজিয়ে ওঠা আগাছার মত ছড়িয়ে পড়েছিল। মু'মিনদের ভয়-ভীতি ও উৎকণ্ঠা অনেক বেড়ে গিয়েছিল, আর হৃদয় আশঙ্কা ও ত্রাসে ভরে গিয়েছিল। এমন (ভীতিকর) সময় (হযরত) আবু বকর (রা.)-কে যুগের শাসক ও হযরত খাতামান্ নবীঈন (সা.)-এর খলীফা নিযুক্ত করা হয়। মুনাফিক, কাফির এবং মুরতাদদের আচার-আচরণ ও হাবভাব দেখে তিনি বেদনায় বিমুঢ় হয়ে পড়েন। তিনি শ্রাবণের বারিধারার ন্যায় অশ্রু বিসর্জন দেন এবং তাঁর অশ্রুধারা প্রবহমান ঝরনার ন্যায় বইতে থাকে আর তিনি (রা.) তাঁর আল্লাহ্র কাছে ইসলাম ও মুসলমানদের কল্যাণের জন্য মিনতি করেন।

হযরত আয়েশা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, তিনি বলেন, আমার পিতাকে যখন খলীফা মনোনীত করা হয় আর আল্লাহ্ যখন তাঁর হাতে নেতৃত্বের বাগডোর তুলে দেন তখন খিলাফতের সূচনাতেই তিনি চতুর্দিক থেকে বিভিন্ন নৈরাজ্য এবং মিথ্যা নবুয়্যতের দাবীকারকদের দৌরাত্ম্য আর মুরতাদ ও মুনাফিকদের বিদ্রোহ সর্বত্র ছড়িয়ে পড়তে দেখেন। তাঁর ওপর এত বেশি বিপদাপদ নেমে আসে যে, তা পাহাড়-পর্বতের ওপর আপতিত হলে নিমিষেই ধূলিসাৎ হয়ে যেতো এবং চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত, কিন্তু তাঁকে নবী-রসূলদের মত সুমহান ধৈর্য প্রদান করা হয়েছে।”

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন, “অবশেষে আল্লাহ্র সাহায্য এসে যায় এবং ভণ্ড নবীদের হত্যা করা হয় আর মুরতাদদের ধ্বংস করে দেওয়া হয়। নৈরাজ্য দূরীভূত হয় আর বিপদাপদ কেটে যায় এবং সমস্যার নিরসন হয়। আর খিলাফত দৃঢ় ভিত্তিতে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ মু'মিনদের বিপদাপদ থেকে রক্ষা করেন আর তাদের ভয়-ভীতির অবস্থাকে শান্তি ও নিরাপত্তায় বদলে দেন, তাদের জন্য তাদের ধর্মকে সুদৃঢ় করে দেন। এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেন এবং নৈরাজ্যবাদীদের চেহারায় কালিমা লেপন করেন বা অপদস্ত করেন। তিনি স্বীয় প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করেন আর নিজ বান্দা (হযরত আবু বকর) সিদ্দীক (রা.)-কে সাহায্য করেন এবং বিদ্রোহী নেতা ও প্রতিমাগুলোকে ধ্বংস ও ধূলিসাৎ করে দেন। আল্লাহ্ কাফিরদের হৃদয়ে এমন ভীতি সঞ্চার করেন যে, তারা পিছপা হয়ে যায়, (অবশেষে) তারা প্রত্যাবর্তন করে এবং তওবা করে। এটিই কাহ্হার খোদার প্রতিশ্রুতি ছিল আর তিনি সত্যবাদীদের মাঝে সবচেয়ে বড় সত্যবাদী। অতএব, গভীরভাবে প্রণিধান করে দেখ, খিলাফতের ভবিষ্যদ্বাণী বা প্রতিশ্রুতি সকল আনুষঙ্গিকতা ও লক্ষণসহ হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)'র সত্তায় কীভাবে পূর্ণ হয়েছে! আমি আল্লাহ্র কাছে দোয়া করি, তিনি যেন এই তাৎপর্য বুঝার জন্য তোমাদের বক্ষকে উন্মুক্ত করে দেন।” {হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন,} “গভীরভাবে প্রণিধান করে দেখ, তিনি যখন খলীফা হন তখন মুসলমানদের অবস্থা কেমন ছিল? বিপদাপদ বা সমস্যার কারণে ইসলাম অগ্নিদগ্ধ ব্যক্তির ন্যায় (দুর্বল) হয়ে গিয়েছিল। এরপর আল্লাহ্ তা'লা ইসলামকে পুনরায় আপন শক্তি ফিরিয়ে দিয়েছেন এবং অন্ধকারাচ্ছন্ন গভীর কূপ থেকে উদ্ধার করেছেন। নবুয়্যতের ভণ্ড দাবীদারদের যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিয়ে হত্যা করা হয়, ধর্মত্যাগীদের চতুষ্পদ জন্তুর ন্যায় ধ্বংস করা হয়। (এভাবে) আল্লাহ্ মু'মিনদের সেই ভয়-ভীতি থেকে যাতে তারা মৃতবৎ ছিল শান্তি ও নিরাপত্তা দান করেন। এসব সমস্যা থেকে উত্তরণের পর মু'মিন বান্দারা আনন্দিত হন আর (হযরত আবু বকর) সিদ্দীক (রা.)-কে মুবারকবাদ দিতেন আর প্রাণঢালা শুভেচ্ছা জানিয়ে তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। তাঁর প্রশংসা করতেন এবং মহামহিম প্রভুর দরবারে তাঁর জন্য দোয়া করতেন। তারা তাঁর প্রতি সম্মান ও মর্যাদা প্রদর্শনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়তেন। আর তাঁর প্রতি তাদের ভালোবাসাকে তারা নিজেদের হৃদয়ের গহীনে স্থান দেন আর নিজেদের সকল বিষয়ে তাঁর অনুসরণ করে চলতেন এবং তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ ছিলেন। তারা নিজেদের হৃদয়কে আলোকিত এবং চেহারাকে উৎফুল্ল করেছেন। এভাবে তারা ভালোবাসা ও হৃদ্যতায় সমৃদ্ধ হয়েছেন এবং সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা করে

তাঁর আনুগত্য করেছেন। তারা তাঁকে এক আশিসময় ব্যক্তিত্ব এবং নবীদের ন্যায় ঐশী সাহায্যপ্রাপ্ত জ্ঞান করতেন আর এ সবকিছুই ছিল (হযরত আবু বকর) সিদ্দীক (রা.)'র সততা ও দৃঢ় বিশ্বাসের কারণে।" **(সীর্‌রুল খিলাফার উর্দূ অনুবাদ, নাযারাতে এশায়াত কর্তৃক প্রকাশিত, পৃ: ৪৭-৫১)**

এটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আরবী পুস্তক **'সির্‌রুল খিলাফা'**র উদ্ধৃতির উর্দূ অনুবাদ। ধর্মত্যাগের নৈরাজ্য এবং বিদ্রোহ যখন মাথাচাড়া দেয় তখন তা দমনের উদ্দেশ্যে হযরত আবু বকর (রা.) কতক সেনাভিযান পরিচালনা করেন যেমনটি পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, মহানবী (সা.)-এর মৃত্যুর পর প্রায় পুরো আরব বিশ্বই ধর্মত্যাগের পথ বেছে নিয়েছিল। এদের মাঝে কতিপয় মানুষ এমন ছিল যারা কেবল যাকাত প্রদানে অস্বীকৃতি জানিয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.)'র পক্ষ থেকে যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল তার বিবরণ পূর্বে দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় যে দলের উল্লেখ করা হয় তারা কেবল ইসলাম ধর্ম থেকেই ফিরে যায় নি বরং বিদ্রোহও করেছিল এবং মুসলমানদের হত্যাও করছিল। তখন হযরত আবু বকর (রা.) তাদের দমন করার সংকল্প করেন। যেমন, **আল্ বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া** পুস্তকে লেখা আছে, হযরত উসামা (রা.)'র বাহিনীর বিশ্রাম গ্রহণের পর হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামী সেনাদলের সাথে তরবারি হাতে মদীনা থেকে বাহনে আরোহণ করে **যুল্ কাস্‌সা** অভিমুখে যাত্রা করেন যা মদীনা থেকে একরাত ও একদিন দূরত্বে অবস্থিত (সে যুগের সফরের মাধ্যম অনুযায়ী)। সাহাবায়ে কেরাম (রা.) যাদের মাঝে হযরত আলী (রা.)'ও ছিলেন সবাই হযরত আবু বকর (রা.)-কে জোরাজুরি করে বলছিলেন যে, আপনি মদীনায় ফিরে আসুন এবং মরুবাসীদের সাথে যুদ্ধের জন্য আপনি ছাড়া অন্য কোন বীর সেনাকে পাঠিয়ে দিন। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার পিতা তরবারি হাতে বাহনের ওপর আরোহণ করে যাত্রা করেন তখন হযরত আলী বিন আবী তালেব (রা.) এসে তাঁর উটনীর লাগাম ধরে নিবেদন করেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর খলীফা! আমি আপনাকে সে কথা বলবো যা মহানবী (সা.) উহুদের দিন বলেছিলেন, আপনি কেন তরবারি ধারণ করেছেন? আপনার প্রাণ বা অস্তিত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে আমাদেরকে বিপদে ফেলবেন না। হযরত আলী (রা.) হযরত আবু বকর (রা.)-কে বলেন, আপনার প্রাণ হুমকির মুখে ঠেলে দিয়ে আমাদেরকে বিপদে ফেলবেন না। খোদার কসম! যদি আপনার জীবন হুমকিগ্রস্ত হয় তাহলে আপনার পর ইসলামী ব্যবস্থা চিরতরে হারিয়ে যাবে। তখন হযরত আবু বকর (রা.) ফিরে যান আর (কেবল) সেনাবাহিনীকে প্রেরণ করেন। **(আল্ বিদায়া ওয়ান্ নিহায়া, ৩য় খণ্ড, ৬ষ্ঠ অধ্যায়, পৃ: ৩১১-৩১২, দ্বারুল কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে প্রকাশিত)**

হযরত উসামা (রা.) এবং তার বাহিনী বিশ্রাম সেরে নেয় আর তাদের বাহনগুলোও উদ্যম ফিরে পায়, অধিকন্তু যাকাতের সম্পদও প্রচুর পরিমাণে হস্তগত হয়, যা মুসলমানদের প্রয়োজনের অতিরিক্ত ছিল, তখন হযরত আবু বকর (রা.) সেনাবাহিনীকে বিভক্ত করেন এবং এগারোটি পতাকা বাঁধেন। **একটি পতাকা** হযরত খালেদ বিন ওয়ালীদের জন্য বাঁধেন এবং তাকে নির্দেশ দেন যেন তিনি তুলায়হা বিন খুয়ায়লেদকে দমনের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তাকে দমনের পর **বুতাহা**'তে

মালেক বিন নুওয়ারাকে মোকাবিলার জন্য যান, যদি ততক্ষণ পর্যন্ত সে তাদের বিরুদ্ধে অনড় থাকে। তারা সবাই যুদ্ধ করতে উদ্যত মুরতাদ ছিল। **বুতাহা** বনু আসাদ গোত্রের এলাকায় একটি ঝর্নার নাম; তিনি (তাদেরকে) সেদিকে প্রেরণ করেন। হযরত ইকরামা বিন আবু জাহল (রা.)'র জন্য **দ্বিতীয় পতাকা** বাঁধেন আর মুসায়লামাকে মোকাবিলার জন্য তাকে নির্দেশ দেন। **তৃতীয় পতাকা** হযরত মুহাজির বিন আবু উমাইয়্যা (রা.)'র জন্য বাঁধেন এবং তাকে **আনসী**'র বাহিনীকে মোকাবিলা করার নির্দেশ দেন। অতঃপর কায়েস বিন মাক্‌শূহ্‌ এবং সেসব ইয়েমেনবাসীকে মোকাবিলার নির্দেশ দেন যারা **আবনা**'র সাথে যুদ্ধরত ছিল, তাকে নির্দেশ দেন **আবনা**'দের সাহায্য করতে। **আবনা** পারস্যবংশীয় একটি জাতির পরবর্তী প্রজন্ম ছিল যারা ইয়েমেনে বসতি স্থাপন করেছিল এবং আরবদের সাথে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিল। তাকে সেখানকার কাজ শেষে **কিন্দাহ্**'কে দমনের জন্য **হাযার মওত** যাওয়ার নির্দেশ দেন। **হাযার মওত** ইয়েমেনের একটি অঞ্চল। **চতুর্থ পতাকা** হযরত খালেদ বিন সাঈদ বিন আস (রা.)'র জন্য বাঁধেন এবং তাকে **হামকাতাইন** অভিমুখে প্রেরণ করেন, যা সিরিয়ার সীমান্তে অবস্থিত। **পঞ্চম পতাকা** হযরত আমর বিন আস (রা.)'র জন্য বাঁধেন এবং তাকে কুযাআ, ওয়াদীআহ্‌ এবং হারেস-এর বাহিনীর মোকাবিলার জন্য অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। **ষষ্ঠ পতাকা** হযরত হুযায়ফা বিন মিহসান গালফানি (রা.)'র জন্য বাঁধেন এবং তাকে **দাবা**বাসীদের উদ্দেশ্যে যাওয়ার নির্দেশ দেন। **'দাবা'** ওমানে আরবদের একটি বাজার এবং ওমানের একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ শহর ছিল। সেখানে বাজার বসতো। **সপ্তম পতাকা** হযরত **'আরফাজাহ্‌ বিন হারসামা'**র জন্য বাঁধেন এবং তাকে **'মাহরা'** অভিমুখে যাওয়ার নির্দেশ দেন। **'মাহরা'** ইয়েমেনের একটি অঞ্চলের নাম। হযরত আবু বকর (রা.) তাদের উভয়কে এক স্থানে একত্রিত হওয়ার নির্দেশ দেন কিন্তু যেসব অঞ্চলের দায়িত্ব তাদের প্রতি অর্পণ করা হয়েছিল সেখানে তারা একে অন্যের আমীর হবেন। অর্থাৎ, একজন ইয়েমেনে আমীর হবেন আর দ্বিতীয়জন অন্যত্র। হযরত আবু বকর (রা.) [**অষ্টম পতাকা** বেঁধে] শুরাহ্‌বিল বিন হাসানাকে প্রেরণ করেন ইকরামা বিন আবু জাহলের পিছনে এবং নির্দেশ দেন, ইয়ামামার কাজ শেষে **কুযাআ**'কে দমনের জন্য চলে যেও আর মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সময় তুমি-ই নিজ বাহিনীর আমীর হবে। **নবম পতাকা** হযরত তুরায়ফাহ্‌ বিন হাজেয (রা.)'র জন্য বাঁধেন এবং তাকে **বনু সুলায়েম** এবং **হওয়াযেন** গোত্রের মোকাবিলার নির্দেশ দেন। **দশম পতাকা** হযরত সুয়ায়েদ বিন মুকাররিন (রা.)'র জন্য বাঁধেন এবং তাকে **ইয়েমেনের তিহামা অঞ্চল** অভিমুখে যাওয়ার নির্দেশ দেন। আর **একাদশতম পতাকা** হযরত আলা বিন হাযরামি (রা.)'র জন্য বাঁধেন এবং তাকে বাহরাইন যাওয়ার নির্দেশ প্রদান করেন। অতএব, উক্ত আমীরগণ **যুল্‌ কাস্‌সা** থেকে নিজ নিজ গন্তব্যে যাত্রা করেন। **(তারীখুত্‌ তাবরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৭, লেবাননের দ্বারুল্‌ কুতুবুল্‌ ইলমিয়্যাহ্‌ থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত), {সৈয়্যদনা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) শাখসিয়্যত ও কারনামে, পৃঃ ২৮৮, পাকিস্তানের মুজাফ্‌ফরগড়স্থ আল্‌ ফুরকান ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত}, (মু'জিমুল বুলদান, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৫২৭, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৭০, ৩১১, ৪৯৬)**

হযরত আবু বকর (রা.) প্রত্যেক দলের আমীরকে গমন পথের শক্তিশালী মুসলমানদেরকে নিজেদের সাথে নেয়ার আর কতিপয় শক্তিশালী ব্যক্তিকে এলাকার সুরক্ষার্থে পিছনে রেখে যাওয়ার নির্দেশ দেন। **(তারীখুত্ তাবরী, ২য় খণ্ড, পৃ: ২৫৭, লেবাননের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০১২ সালে প্রকাশিত)**

হযরত আবু বকর (রা.)'র উক্ত বণ্টনের উল্লেখ করতে গিয়ে জনৈক লেখক লিখেন,

'যুল্ কাস্সা' সামরিক কেন্দ্র হিসেবে নির্ধারিত হয়। এখান থেকে সুশৃঙ্খল ইসলামী সেনাদলগুলো ধর্মত্যাগের হিড়িককে দমনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন অঞ্চল অভিমুখে যাত্রা করে। হযরত আবু বকর (রা.)'র পরিকল্পনা থেকে অনন্য বুদ্ধিমত্তা এবং সূক্ষ্ম ভৌগলিক অভিজ্ঞতার বিষয়টি প্রমাণিত হয়। সেনাদলগুলোর বণ্টন এবং তাদের গন্তব্য নির্ধারণ থেকে স্পষ্ট হয় যে, হযরত আবু বকর (রা.) সূক্ষ্ম ভৌগলিক জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন আর ভূমির চিহ্নাবলী ও জনবসতি এবং আরব উপদ্বীপের বিভিন্ন (যাতায়াত) পথ সম্পর্কে সম্যক অবগত ছিলেন। (মোটকথা) গোটা আরব উপদ্বীপ যেন মূর্তীমানরূপে তার চোখের সামনে ছিল, যেমনটি বর্তমান যুগের আধুনিক প্রযুক্তিতে সজ্জিত সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রগুলোতে হয়ে থাকে। যে-ই সৈন্যবাহিনীকে রওয়ানা করা, তাদের গন্তব্য নির্ধারণ, বিভক্ত হওয়ার পর (সৈন্যদলগুলোকে) সংঘবদ্ধ করা এবং পুনরায় সংঘবদ্ধ হবার জন্য বিভক্ত করার বিষয়টি গভীর মনোযোগ দিয়ে বিশ্লেষণ করবে, সে খুব ভালোভাবে বুঝতে পারবে যে, এই পরিকল্পনা প্রণয়ন সমগ্র আরব উপদ্বীপের ক্ষেত্রে আদর্শ ও যথার্থ ধারণার ভিত্তিতে করা হয়েছিল, আর সেই সৈন্যদলগুলোর সাথে যোগাযোগও ছিল একান্ত নিখুঁত। আবু বকর (রা.) সারাক্ষণ এই খবর পেতেন যে, সৈন্যদল কোথায় রয়েছে; আর তাদের গতিবিধি ও যাবতীয় বিষয়াদি সম্পর্কে খুব ভালোভাবে অবগত থাকতেন। আর এ-ও জানতেন যে, তারা কী কী সাফল্য অর্জন করেছে এবং আগামীকাল তাদের পরিকল্পনা কী? যোগাযোগ ব্যবস্থা একান্ত নিখুঁত ও দ্রুত হতো এবং রণক্ষেত্র থেকে নিরবচ্ছিন্ন ভাবে সংবাদ সদর দপ্তর মদীনায় আবু বকর (রা.)'র কাছে আসতে থাকতো; পুরো সেনাদলের সাথে সর্বদা যোগাযোগ থাকতো। সদর দপ্তর ও যুদ্ধক্ষেত্রের মাঝে সামরিক সংবাদ পৌঁছানোর কাজে আবু খায়সামা আনসারী, সালামা বিন সালামা, আবু বারযা আসলামী ও সালামা বিন ওয়াকশ অসাধারণ ভূমিকা রাখেন।

আবু বকর (রা.) যেসব সৈন্যদল প্রেরণ করেছিলেন তাদের নিজেদের মাঝেও যোগাযোগ বহাল ছিল এবং তা খিলাফতের গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল, কেননা উক্ত সৈন্যদলগুলোর মাঝে সুদক্ষ নেতৃত্বের পাশাপাশি উত্তম শৃঙ্খলাও বিরাজমান ছিল। এছাড়া যুদ্ধের অভিজ্ঞতাও আগে থেকেই ছিল। মহানবী (সা.)-এর যুগে গযওয়া [এমন যুদ্ধ যাতে মহানবী (সা.) স্বয়ং অংশগ্রহণ করেছিলেন] ও সারিয়্যাসমূহে [এমন যুদ্ধাভিযান যাতে মহানবী (সা.) স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন না] এসব সামরিক কর্মকাণ্ডের ভালো অভিজ্ঞতা তাদের অর্জিত হয়েছিল। আবু বকর (রা.)'র শাসনাধীন সামরিক ব্যবস্থাপনা আরব উপদ্বীপের সকল সামরিক শক্তির ওপর শ্রেষ্ঠত্ব রাখতো। আর সেসব সৈন্যদলের নেতৃত্বে ছিলেন 'আল্লাহ্‌র তরবারি' খ্যাত খালীদ বিন ওয়ালীদ, যিনি ইসলামের জয়যাত্রা ও মুরতাদবিরোধী অভিযানসমূহে অনন্য প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের অধিকারী

ছিলেন। মুসলিম বাহিনীর এই বণ্টন একান্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক পরিকল্পনার অধীনে সম্পন্ন করা হয়েছিল, কারণ মুরতাদরা তখন পর্যন্ত নিজ নিজ অঞ্চলে বিভক্ত ছিল; [অর্থাৎ বিক্ষিপ্ত অবস্থায় ছিল, সংঘবদ্ধ হয় নি] মুসলমানদের বিরুদ্ধে তারা তখনও সংঘবদ্ধ হয়ে উঠতে পারে নি। বড় গোত্রগুলো দূর-দূরান্তের অঞ্চলগুলোতে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় ছিল। নিজেদের মধ্যে সংঘবদ্ধ হবার মতো যথেষ্ট সময় তাদের কাছে ছিল না; কারণ ধর্মত্যাগের হিড়িক আরম্ভ হওয়ার তখনও তিন মাসের বেশি সময় পার হয় নি। দ্বিতীয়তঃ তাদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের পক্ষ থেকে আক্রমণের শঙ্কা তারা বুঝে উঠতে পারে নি। তারা ধরে নিয়েছিল, কয়েক মাসের মধ্যেই সকল মুসলমানকে নিশ্চিহ্ন করে ফেলবে। এ কারণেই হযরত আবু বকর (রা.) অতর্কিত আক্রমণ করে– তারা নিজেদের অলীক বিশ্বাসের সমর্থনে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার পূর্বেই তাদের শক্তি-সামর্থ্য নিঃশেষ করে দিতে চেয়েছিলেন। এজন্যই হযরত আবু বকর (রা.) তাদের নৈরাজ্য বৃদ্ধি পাওয়ার পূর্বেই তাদের দমন করেন আর তাদেরকে এই সুযোগই দেন নি যে, তারা মাথাচাড়া দিবে বা বড়বড় বুলি আওড়াবে; যার মাধ্যমে মুসলমানদেরকে কষ্টে নিপতিত করতে পারে। {ড. আলী মুহাম্মদ সালাবী অনূদিত সৈয়্যদনা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) শাখসিয়্যত ও কারনামে, পৃঃ ২৮৮-২৯০, পাকিস্তানের মুজাফ্ফরগড়স্থ আল্ ফুরকান ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত}

হযরত আবু বকর (রা.)'র পক্ষ থেকে কর্মকর্তা নিযুক্তি প্রসঙ্গে বিভিন্ন বিষয়ের উল্লেখ করতে গিয়ে জনৈক লেখক লিখেন, **প্রথমতঃ** উক্ত পরিকল্পনার অধীনে এই ব্যবস্থা নেয়া হয় যে, সৈন্যদলগুলোর মাঝে পারস্পরিক যোগাযোগ ও সহযোগিতা যেন সর্বদা বজায় থাকে। যদিও তাদের অবস্থান ও গন্তব্য ভিন্ন ভিন্ন ছিল, কিন্তু সবাই একই শিকলে আবদ্ধ ছিল। তাদের পরস্পর মিলিত হওয়া বা পৃথক হওয়া ছিল একই উদ্দেশ্যে, আর খলীফা মদীনায় অবস্থানরত হলেও, যুদ্ধের যাবতীয় বিষয়ের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা তাঁর হাতেই ছিল, [অর্থাৎ খলীফার হাতেই ছিল।] **দ্বিতীয়তঃ** হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) রাজধানী মদীনার সুরক্ষার্থে সেনাবাহিনীর একাংশ নিজের কাছে রাখেন, সেই সাথে রাষ্ট্রীয় বিষয়াদিতে মতামত ও পরামর্শ প্রদানের জন্য জ্যেষ্ঠ সাহাবীদের একটি দলও নিজের কাছে রাখেন। **তৃতীয়তঃ** আবু বকর (রা.) জানতেন যে, ধর্মত্যাগে প্রভাবিত অঞ্চলগুলোতে ইসলামী শক্তির উপস্থিতি বিদ্যমান। তাঁর এই দুশ্চিন্তাও হয় যে, কোথাও এই মুসলমানরা আবার মুশরিকদের ক্রোধের লক্ষ্যস্থলে না পরিণত হয়! এজন্য (সৈন্যদলের) নেতাদেরকে তিনি নির্দেশ দেন যে, তাদের মধ্য থেকে যারা শক্তি-সামর্থ্য রাখে তাদেরকে দলভুক্ত করে নাও আর ঐসকল এলাকার সুরক্ষাকল্পে কিছু লোক সেখানে নিয়োজিত কর। **চতুর্থতঃ** মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে হযরত আবু বকর (রা.) **"আল্ হারবু খুদআতুন"** নীতি অবলম্বন করেন। সেনাদলের লক্ষ্য কিছু প্রকাশ করতো অথচ উদ্দেশ্য হত ভিন্ন। তিনি সর্বোচ্চ সাবধানতা এবং সতর্কতা অবলম্বন করেন যেন পরিকল্পনা ফাঁস না হয়ে যায়। এভাবে হযরত আবু বকর (রা.)'র নেতৃত্বে রাজনৈতিক নৈপুণ্য, জ্ঞানের গভীরতা ও সুপ্রোথিত জ্ঞানে ব্যুৎপত্তি আর বিজয় ও ঐশী সাহায্য-সহযোগিতা দর্শনীয়ভাবে চোখে পড়ে। {ড. আলী মুহাম্মদ সালাবী অনূদিত সৈয়্যদনা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) শাখসিয়্যত ও কারনামে, পৃঃ ২৯৭-২৯৮, পাকিস্তানের মুজাফ্ফরগড়স্থ আল্ ফুরকান ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত}

সে সময় হযরত আবু বকর (রা.) দুটি ‘ফরমান’ তথা অধ্যাদেশ লিখেছিলেন যার একটি ছিল আরব গ্রোত্রগুলোর নামে এবং অপরটি ছিল সেনাপ্রধানদের জন্য পথনির্দেশিকাস্বরূপ। **{খুরশীদ আহমদ ফারুক রচিত হযরত আবু বকর (রা.)-কে সরকারী খতূত, পৃ: ২২}**

প্রথম লেখক ড. আলী মুহাম্মদ সালাবী একটি পত্র সম্পর্কে লিখেন, ইসলামী সেনাদলের প্রস্তুতি এবং সুপরিকল্পিত বিন্যাসের পর আমরা দেখি, পত্রের মাধ্যমে প্রচার (ও শিক্ষামূলক কার্যক্রম) অব্যাহত ছিল আর তা এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

তিনি (রা.) একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র লেখেন যা ছিল সীমিত বিষয় সম্বলিত। মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সৈন্যদল প্রেরণ করার পূর্বে তিনি (রা.) সেই পত্র মুরতাদ এবং (ইসলামে) দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তিবর্গ তথা সবার মাঝে ব্যাপকহারে প্রচার করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। বিভিন্ন গোত্রের কাছে লোকদের প্রেরণ করেন এবং তিনি আদেশ প্রদান করেন যে, সেখানে পৌঁছে প্রত্যেক জনসভায় এই পত্র পড়ে শোনাবে আর যে-ই এই পত্রের বিষয়বস্তু সম্বন্ধে অবগত হবে তাকে আদেশ করেন, সে যেন ঐসব লোকের কাছে উক্ত (পত্রের) বিষয়বস্তু পৌঁছে দেয়, যাদের কাছে তা পৌঁছায় নি। হযরত আবু বকর (রা.) উক্ত পত্রে সর্বসাধারণকে সম্বোধন করেন, হোক সে ইসলামে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত অথবা মুরতাদ। **{ড. আলী মুহাম্মদ সালাবী অনূদিত সৈয়্যদনা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) শাখসিয়্যত ও কারনামে, পৃ: ২৯০-২৯১, পাকিস্তানের মুজাফ্‌ফরগড়স্থ আল্‌ ফুরকান ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত}**

আরব গোত্রগুলোর উদ্দেশ্যে প্রেরিত হযরত আবু বকর (রা.)’র উক্ত পত্রের বিষয়বস্তু তাবারী সবচেয়ে বেশি বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন। হযরত আকদাস মসীহ্‌ মওউদ (আ.)’ও তাঁর পুস্তক **‘সিররুল খিলাফা’**য় উক্ত পত্রের উল্লেখ করেছেন। তিনি (আ.) বলেন, উক্ত পত্রটি আমরা এখানে তুলে ধরা সঙ্গত মনে করছি যেটি সিদ্দীকে আকবর সেসব আরব গোত্রগুলোর উদ্দেশ্যে লিখেছিলেন যারা মুরতাদ হয়ে গিয়েছিল। এই পত্রের বিষয়ে যারা অবগত হবে, তারা সিদ্দীকে আকবরের আল্লাহ্‌র নিদর্শনের মর্যাদা প্রতিষ্ঠা এবং মহানবী (সা.) যা-ই সূচিত করেছেন তার সুরক্ষার ক্ষেত্রে দৃঢ়তাকে দেখে যেন ঈমান এবং অন্তর্দৃষ্টিতে উন্নতি করতে পারে। [এরপর হযরত মসীহ্‌ মওউদ (আ.) উক্ত পত্রটি হুবহু তুলে ধরেন, যা এভাবে শুরু হয়েছে]

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

এতদ্বারা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর খলীফা আবু বকরের পক্ষ থেকে সর্বসাধারণের যার কাছেই এ পত্র পৌঁছে তাকে জানানো যাচ্ছে যে, সে নিজে ইসলামে প্রতিষ্ঠিত থাকুক বা পূর্বাবস্থায় ফিরে গিয়ে থাকুক, যে সঠিক পথের অনুসরণ করে আর সত্যগ্রহণের পর ভ্রষ্টতা ও অন্ধত্বের দিকে ফিরে না যায় তার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। আমি তোমাদের সামনে সেই খোদার প্রশংসা করছি যিনি ছাড়া আর কোন উপাস্য নেই, আমি আরও সাক্ষ্য দিচ্ছি, আল্লাহ্‌ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই, তিনি এক-অদ্বিতীয়, তাঁর কোন শরীক নেই আর মুহাম্মদ (সা.) তাঁর বান্দা ও রসূল। আর তিনি যে শিক্ষা নিয়ে এসেছেন আমরা তা মান্য করি আর যে তা অস্বীকার করে আমরা তাকে কাফির আখ্যা দেই এবং আমরা তার বিরুদ্ধে জিহাদ করি। এরপর স্মরণ থাকে! আল্লাহ্‌ তা’লা নিজ

সন্নিধান থেকে মুহাম্মদ (সা.)-কে, যারা জীবিত তাদের সতর্ক করতে এবং কাফিরদের বিরুদ্ধে সত্য প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে শুভ সংবাদদাতা, সতর্ককারী, তাঁর নির্দেশে খোদার পানে আহ্বানকারী এবং এক দীপ্তিমান সূর্য হিসেবে তাঁর সৃষ্টির প্রতি সত্যসহকারে প্রেরণ করেছেন। অতএব, যে তাঁকে (সা.) গ্রহণ করেছে আল্লাহ্ তাকে সত্যের পানে হিদায়াত দিয়েছেন আর যে তাঁর প্রতি পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছে তার বিরুদ্ধে মহানবী (সা.) ততক্ষণ যুদ্ধ করেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত সে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বা বাধ্য হয়ে ইসলামের দিকে ফিরে না এসেছে। এরপর আল্লাহ্‌র রসূল (সা.) ইন্তেকাল করেন। তিনি আল্লাহ্‌র আদেশকে পৃথিবীতে প্রবর্তন করেছেন এবং উম্মতের হিতসাধনের জন্য সম্ভাব্য সব কিছু করেছেন। তাঁর ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব তিনি পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পালন করেছেন। আর আল্লাহ্ তাঁর ও ইসলামের অনুসারীদের জন্য তাঁর এ কিতাবে যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন- এ কথা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। যেমন (তিনি) বলেছেন, إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ অর্থাৎ, নিশ্চয় তুমিও মৃত্যুবরণ করবে আর তারাও মৃত্যুবরণ করবে। (সূরা আয্ যুমার: ৩১) আরও বলেন, وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْدَ আর আমরা কোন মানুষকে তোমার পূর্বে চিরস্থায়ী জীবন দান করিনি। أَفَإِنْ مِتَّ فَهُمُ الْخَالِدُونَ অতএব, যদি তুমি মারা যাও তাহলে তারা কি চিরদিন বেঁচে থাকবে? (সূরা আল্ আম্বিয়া: ৩৫) এরপর মু'মিনদের উদ্দেশ্য করে বলেন, وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ অর্থ: আর মুহাম্মদ একজন রসূল ছাড়া আর কিছুই নয়। নিশ্চয়ই তাঁর পূর্বের সকল রসূল গত হয়েছেন। অতএব, তিনিও যদি মারা যান বা নিহত হন তাহলে তোমরা কি তোমাদের গোড়ালির ওপর ফিরে যাবে? আর যে-ই তার গোড়ালিদ্বয়ের ওপর ফিরে যাবে সে আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ্ কৃতজ্ঞদের অবশ্যই প্রতিদান দেন। (সূরা আলে ইমরান: ১৪৫) তিনি (আ.) পুনরায় লিখেন, অতএব, যে মুহাম্মদ (সা.)-এর ইবাদত করতো তার জানা উচিত, তিনি (সা.) মৃত্যুবরণ করেছেন আর যে এক-অদ্বিতীয় আল্লাহ্‌র ইবাদত করতো তার জানা উচিত, আল্লাহ্ তার (সাথে সাক্ষাতের) অপেক্ষায় আছেন, তিনি চিরঞ্জীব ও জীবনদাতা, চিরস্থায়ী ও স্থিতিদাতা। তিনি মরবেন না আর তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করে না। তিনি স্বীয় কাজের রক্ষণাবেক্ষণকারী, শত্রুর কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করেন এবং তাকে শাস্তি দিয়ে থাকেন। আমি তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র তাক্বওয়া অবলম্বন এবং তাঁর সন্নিধানে তোমাদের যে ভাগ্য ও অদৃষ্ট নির্ধারিত আছে তা অর্জনের চেষ্টা করার পাশাপাশি এবং তোমাদের নবী (সা.) কর্তৃক আনীত শিক্ষার ওপর অনুশীলন করার জন্য তোমাদেরকে তাকিদপূর্ণ নির্দেশ দিচ্ছি। এছাড়া তোমরা তাঁর (সা.) পথনির্দেশনা হতে পথের দিশা নাও এবং আল্লাহ্‌র ধর্মকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে রাখ, কেননা আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত না দেন সে ভ্রষ্ট, যাকে তিনি রক্ষা না করেন সে পরীক্ষায় পড়বে। তিনি যাকে সাহায্য করবেন না তার কোন সাহায্য-সহায়তাকারী নেই। অতএব, সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দেন আর যাকে

তিনি ভ্রষ্ট আখ্যা দেন সে-ই পথভ্রষ্ট। অতএব, আল্লাহ্ বলেন, مَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا অর্থাৎ, আল্লাহ্ যাকে হিদায়াত দেন সে-ই হিদায়াতপ্রাপ্ত এবং তিনি যাকে পথভ্রষ্ট সাব্যস্ত করেন তার জন্য তুমি কোন হিদায়াতদাতা বন্ধু খুঁজে পাবে না। (সূরা আল্ কাহফ: ১৮)
এরপর তিনি (আ.) লিখেন,

"এ পৃথিবীতে কৃত তার কোন কর্ম ততক্ষণ পর্যন্ত গৃহীত হবে না যতক্ষণ সে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ না করবে, পরকালেও তার পক্ষ থেকে কোন মূল্য বা বিনিময়ও গ্রহণ করা হবে না। আর আমার কাছে এ সংবাদ পৌঁছেছে যে, তোমাদের কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ ও এর ওপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর আল্লাহ্ তা'লাকে ধোঁকা দিয়ে এবং তাঁর বিষয়ে অজ্ঞতা প্রদর্শন করে শয়তানের ডাকে সাড়া দিয়ে মুরতাদ হয়ে গেছে। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا অর্থ: আর স্মরণ কর আমরা যখন ফিরিশ্‌তাদের বলেছিলাম তোমরা আদমের জন্য সিজদাবনত হও তখন ইবলিস ছাড়া সবাই সিজদা করলো, সে ছিল জিন্নদের একজন। অতএব, সে তার প্রভু-প্রতিপালকের আদেশ অমান্য করলো। কাজেই, তোমরা কি আমার পরিবর্তে তাকে ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের নিজেদের বন্ধু বানাচ্ছো অথচ তারা তোমাদের শত্রু? যালেমদের জন্য বিনিময় অতি মন্দ হয়ে থাকে। (সূরা আল্ কাহফ: ৫১)

তিনি আরও বলেন, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا إِنَّمَا يَدْعُو حِزْبَهُ لِيَكُونُوا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيرِ অর্থ: নিশ্চয় শয়তান তোমাদের শত্রু। অতএব, তোমরা তাকে শত্রু বলেই জেনো। সে নিজের দলবলকে শুধু এ জন্যই ডাকে যেন তারা লেলিহান আগুনের অধিবাসী হয়ে যায়। (সূরা আল্ ফাতের: ৭)

এই পত্রের উল্লেখ করে তিনি (আ.) বলেন, আর আমি মুহাজির ও আনসার এবং উত্তম আমলের অনুসারী তাবেঈনদের সেনাদলের জন্য অমুক ব্যক্তিকে (আমীর) নিযুক্ত করে তোমাদের নিকট প্রেরণ করেছি আর আমি তাকে আদেশ দিয়েছি, সে যেন কারো সাথে যুদ্ধ না করে এবং আল্লাহ্ তা'লার বাণী না পৌঁছানো পর্যন্ত সে যেন তাকে হত্যাও না করে। এরপর যে এই বার্তা গ্রহণ করবে, স্বীকৃতি দিবে এবং বিরত হবে আর সৎকর্ম সম্পাদন করবে তাহলে তাকে যেন সে মেনে নেয় এবং এক্ষেত্রে তাকে সাহায্য করে। কিন্তু যে অস্বীকার করবে তার (বিষয়ে) আমি তাকে নির্দেশ দিয়েছি, সে যেন তার সাথে এ বিষয়ে যুদ্ধ করে এবং যাদেরকে পরাস্ত করবে তাদের কাউকেই যেন ছাড় না দেয়। এরপর সে যেন তাদেরকে হয় আগুনে পুড়িয়ে মারে না হয় যে কোনভাবেই হোক তাদের হত্যা করে। আর মহিলা ও শিশুদের যেন বন্দি করে এবং কারো কাছ থেকেই যেন ইসলাম ছাড়া অন্য কিছু গ্রহণ না করে। এরপর যে তার আনুগত্য করবে তা হবে তার

জন্য উত্তম কিন্তু যে তাকে পরিত্যাগ করবে সে আল্লাহ্‌কে ব্যর্থ করতে পারবে না। এছাড়া আমি আমার বার্তাবাহককে নির্দেশ দিয়েছি, সে যেন আমার এই পত্র তোমাদের প্রত্যেক সমাবেশে পাঠ করে শোনায় আর আযানই হল ইসলামের ঘোষণা। কাজেই, মুসলমানরা যখন আযান দিবে তখন তারাও যদি আযান দেয়, তাহলে তাদের ওপর আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু তারা যদি আযান না দেয় তাহলে তাদের ওপর দ্রুত আক্রমণ কর আর যখন তারা আযান দিবে তখন তাদের ওপর যা কিছু ফরয বা আবশ্যিক কর্তব্য তা দাবি কর কিন্তু তারা যদি অস্বীকৃতি জানায় তাহলে তাদের ওপর ত্বরিৎ আক্রমণ কর কিন্তু যদি স্বীকার করে নেয় তাহলে তাদের কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হোক।" **(সীরুরুল খিলাফার উর্দূ অনুবাদ, নাযারাতে এশায়াত কর্তৃক প্রকাশিত, পৃঃ ১৯০-১৯৪)**

যাহোক, এ সম্পর্কে যে ব্যাখ্যা ছিল (তা হল), কেন তাদের সাথে যুদ্ধ হয়েছে এবং সবার সাথে কেন এমন আচরণ করা হয়েছে? এর কারণ হল, এসব লোক যুদ্ধ করতে চাচ্ছিল, মুসমানদের ওপর যুদ্ধ চাপিয়ে দিচ্ছিল আর কেবল যুদ্ধই করতো না বরং অত্যাচার-নিপীড়নও করছিল আর তাদের অঞ্চলে যেসব অসহায় মুসলমান থাকতো তাদের ওপরও নির্যাতন করছিল।

হযরত আবু বকর (রা.) দ্বিতীয় যে পত্রটি এসব সেনাদলের আমীরদের নামে লিখেছিলেন তাদের সংখ্যা ছিল এগারো জন। তাদের কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। সেই পত্রটি সেনাপ্রধানদের নামে ছিল। সেটি নিম্নে বর্ণিত হল,

বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম

এই পত্রটি রসূল (সা.)-এর খলীফা আবু বকরের পক্ষ থেকে অমুক ব্যক্তির নামে লেখা হয়েছে। (আর তখন লেখা হয়েছে) যখন তিনি তাকে মুসলমান সেনাদলের সাথে মুরতাদদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। অর্থাৎ, তিনি এতে প্রত্যেক আমীরের নাম লিখেছিলেন।

{তিনি (রা.)} আমীরকে জোরালো নির্দেশ দেন যে, সে যেন যথাসাধ্য সকল বিষয়ে স্পষ্টতঃ আল্লাহ্ তা'লার তাক্বওয়া অবলম্বন করে। আর তাকে আল্লাহ্ তা'লার বিষয়ে সংগ্রাম করার এবং সেসব লোকের বিরুদ্ধে জিহাদের নির্দেশ দিয়েছেন যারা আল্লাহ্ বিমুখ হয়েছে এবং ইসলাম থেকে প্রত্যাবর্তন করে শয়তানী কামনা-বাসনার দাসত্ব করেছে। সর্বপ্রথম তাদের সামনে সত্য অকাট্যভাবে তুলে ধরবে এবং তাদেরকে ইসলামের দিকে আহ্বান জানাবে। তারা যদি এটি গ্রহণ করে তাহলে তাদের সাথে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে। কিন্তু তারা যদি এটি মেনে না নেয় তাহলে তাদের ওপর তাৎক্ষণিকভাবে আক্রমন করবে, যতক্ষণ না তারা তার সামনে নতি স্বীকার করে। এরপর সে তাদেরকে তাদের অধিকার ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে বলবে আর তাদের জন্য যা কিছু প্রদান করা আবশ্যক তা আদায় করবে এবং তাদের প্রাপ্য অধিকার তাদেরকে প্রদান করবে। সে যেন তাদেরকে অবকাশ না দেয়, অর্থাৎ এমন সুযোগ যেন না দেয় যার ফলে তারা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে মুসলমানদের ওপর আক্রমণ করে বসবে। সে যেন মুসলমানদেরকে তাদের শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে বাধা না দেয়। মুসলমানরা যদি মনে করে, এরা এমন মানুষ যারা বিরত হবে না এবং তারা যুদ্ধ করতে বদ্ধপরিকর তাহলে তাদেরকে যুদ্ধ করতে বাধা দিবে না। সেসব

নেতাকে এই নির্দেশ প্রদান করেন, যাদেরকে সেই অঞ্চলের মানুষ বেশি চিনতো। অতএব, যে মহা সম্মানিত ও প্রতাপান্বিত আল্লাহ্‌র নির্দেশ মান্য করেছে এবং তাঁর আনুগত্য করেছে তার এই কাজ গ্রহণ করবে এবং ন্যায়সংগত পন্থায় তাকে সাহায্য করবে। আর কেবল তার সাথেই যুদ্ধ করা হবে যে কিনা আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে যা এসেছিল তা স্বীকার করার পর আবার অস্বীকার করে। সে যদি আমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে কোন আপত্তি নেই অবশ্য এরপর সে যা গোপন করেছে আল্লাহ্ তার হিসাব নিবেন। আর যে আল্লাহ্‌র বাণী মেনে নেয় নি তার সাথে যেন যুদ্ধ করা হোক এবং তাকে হত্যা করা হোক, তা সে যেখানেই থাকুক না কেন আর যত সম্পদশালীই হোক না কেন। ইসলাম গ্রহণ করা ছাড়া কারো কাছ থেকে আর কিছুই গ্রহণ করা হবে না। অতএব, যে ইসলাম গ্রহণ করে এবং স্বীকৃতি প্রদান করে তার কাছ থেকে তা গ্রহণ করা হোক এবং তাকে ইসলামী শিক্ষাদীক্ষা প্রদান করা হোক। আর যে অস্বীকার করে, অর্থাৎ মুসলমান হবার পর মুরতাদ হয়ে গেছে আবার যুদ্ধও করছে, তাহলে তো সে ইসলামী শিক্ষা পরিপন্থী কাজ করছে, তাকে বলে দাও, ইসলাম কাকে বলে এবং এর প্রকৃত তাৎপর্য কী? তোমরা মুসলমান হবার দাবি করার পর সরকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পার না। যে অস্বীকৃতি জানাবে তার সাথে যুদ্ধ করা হবে। আল্লাহ্ যদি তাকে তাদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করেন তাহলে তাদেরকে নিষ্ঠুরতার সাথে অস্ত্র ও আগুন দ্বারা হত্যা করা হবে। এরপর আল্লাহ্ তা'লা যে গণীমতের মাল দান করবেন তা থেকে এক পঞ্চমাংশ আমাকে পাঠাবে আর বাকিটা বণ্টন করে দিবে। এরপর সেই সেনাপতি যেন তার সঙ্গীদের ত্বরাপরায়ণতা এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি করা থেকে বিরত রাখে আর তাদের মাঝে যেন কোন বহিরাগতকে অন্তর্ভুক্ত না করে যতক্ষণ না সে জেনে নেয় তার মাঝে কতটা যোগ্যতা রয়েছে। এমন যেন না হয় যে, (সে) গুপ্তচর হবে। অর্থাৎ, কাউকে অন্তর্ভুক্ত করবে আর সে গুপ্তচর হবে। (ভালোভাবে অনুসন্ধান ও যাচাইবাছাই করার পর দলে নিবে।) আর তার কারণে মুসলমানদের ওপর বিপদ নেমে আসবে। সফর এবং সফর বহির্ভূত অবস্থায় মুসলমানদের সাথে নমনীয় ও মধ্যমপন্থা অবলম্বন করবে আর তাদের খোঁজখবর নিতে থাকবে। সৈন্যদের একাংশকে অপর অংশের চেয়ে তাড়াতাড়ি করার নির্দেশ দিবে না। মুসলমানদের প্রতি আচারব্যবহার ও আলাপচারিতায় ভদ্রতা এবং কোমলতা প্রদর্শন করবে। **(তারীখুত্ তাবরী, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৫৮-২৫৯, বৈরুতের দ্বারুল্ কুতুবুল্ ইলমিয়্যাহ্ থেকে ২০২১ সালে প্রকাশিত)**

এখানে কিছু বিষয় এমন রয়েছে যা ব্যাখা করা প্রয়োজন, কিন্তু ব্যাখ্যা করা হয় নি। এ কারণে অনেক সময় ইসলাম সম্পর্কে ভুল ধারণাও সৃষ্টি হয়ে যায়। গত খুতবায় আমি এর ব্যাখ্যা করেছি যে, **এসব মুরতাদ এমন ছিল যারা যুদ্ধ করেছে, (তারা) যুদ্ধবাজ ছিল**। আর কেবল যুদ্ধই করে নি বরং তাদের এলাকায় যেসব মুসলমান ছিল তাদের ওপরও এরা অত্যাচার করেছে। তাদেরকে মেরেছে, আগুনে পুড়িয়েছে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে এবং তাদেরকেও পুড়িয়ে মেরেছে। এ কারণে, তাদের বিরুদ্ধে হযরত আবু বকর (রা.) বলেন, অবশ্যই প্রতিশোধ নিতে হবে আর তাদেরকেও সেই পদ্ধতিতেই (শাস্তি দিবে) যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ও এই

পত্রটি কোট করেছেন যে, একই পদ্ধতিতে তাদেরকেও শাস্তি দিতে হবে। কেননা, এটিই পবিত্র কুরআন তথা আল্লাহ্ তা'লার আদেশ যে, যেমনটি কেউ করে তাকে ঠিক তেমনই শাস্তি দাও। কিন্তু এই লেখক, অর্থাৎ ড. আলী মুহাম্মদ সালাবী সাহেব একস্থানে এ বিষয়টির ব্যাখ্যা এভাবে লিখেন যে, এতে উল্লেখ রয়েছে মুরতাদ বিদ্রোহীদের যেন আগুনে পুড়িয়ে মারা হয়। তিনি লিখেছেন, অথচ কাউকে পুড়িয়ে মারার নির্দেশ দেয়া বৈধ নয়। মহানবী (সা.)-এর নির্দেশ হল, **'ইন্নান্ নারা লা ইউআয্যিবু বিহা ইল্লাল্লাহ্'**। অর্থাৎ, আগুনের শাস্তি দেওয়া কেবল আল্লাহ্ তা'লার কাজ, কিন্তু এখানে তাদেরকে আগুনে পোড়ানোর নির্দেশ দেওয়ার কারণ হল, এই দুষ্টরা মু'মিনদের সাথে এই আচরণই করেছিল, কাজেই এটি কিসাস বা প্রতিশোধস্বরূপ ছিল। **{ড. আলী মুহাম্মদ সালাবী অনূদিত সৈয়্যদনা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) শাখসিয়্যত ও কারনামে, পৃ: ২৯৩, পাকিস্তানের মুজাফ্ফরগড়স্থ আল্ ফুরকান ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত}**

হযরত আবু বকর (রা.)'র পূর্বে বর্ণিত এই চিঠির উল্লেখ করে এই পুস্তকে এটিও লেখা হয়েছে যে, মুসলমানদের দলে ফিরে আসতে যে অস্বীকৃতি জানায় ও ধর্মত্যাগের সিদ্ধান্তে অনড় থাকে সে যুদ্ধবাজ, (তাই) তার ওপর আক্রমণ করা আবশ্যক আর তাকে যেন হত্যা করা হয় ও পুড়িয়ে ফেলা হয়। **{ড. আলী মুহাম্মদ সালাবী অনূদিত সৈয়্যদনা আবু বকর সিদ্দীক (রা.) শাখসিয়্যত ও কারনামে, পৃ: ২৯৪-২৯৫, পাকিস্তানের মুজাফ্ফরগড়স্থ আল্ ফুরকান ছাপাখানা থেকে প্রকাশিত}**

পবিত্র কুরআনেও আল্লাহ্ তা'লা একথাই বলেছেন, তোমাদেরকে যারা কষ্টে নিপতিত করে তাদেরকে তোমরা সেভাবেই শাস্তি দাও– যেমনটি তোমাদের সাথে তারা করেছে। যেমনটি আমি গত খুতবাতেও উল্লেখ করেছি এবং এখনও বলেছি, তারা মুসলমানদেরকে আগুনে পুড়িয়ে এবং তাদেরকে ঘৃণ্য পন্থায় হত্যা করার অপরাধ করেছিল। তাদেরকে আগুনে পুড়িয়েছে, তাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দিয়েছে, তাদের স্ত্রী-সন্তান সবাইকে পুড়িয়ে মেরেছে, তাদের অঙ্গচ্ছেদ করেছে আর এ কারণেই হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ঠিক সেভাবেই তাদেরকে হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছিলেন। অর্থাৎ, যারা এতে জড়িত ছিল তাদের সাথে সেই আচরণই করবে যা তারা মুসলমানদের সাথে করেছিল।

যাহোক, এই স্মৃতিচারণ আগামীতেও অব্যাহত থাকবে, ইনশাআল্লাহ্। রমযানে সম্ভবত অন্যান্য (বিষয়ের) খুতবাও মাঝে আসতে থাকবে। হতে পারে সময় লাগবে কিন্তু যাহোক, আগামীতে এ বিষয়ে যে খুতবাই দেয়া হবে তাতে এর বিস্তারিত বর্ণনা থাকবে।

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক এর তত্ত্বাবধানে অনূদিত)
(আল্ ফযল ইন্টারন্যাশনাল ৬ মে, ২০২২, পৃ: ৫-৮)